ইউনিট- ৩

বুদ্ধি, পরিবেশ ও বংশগতি

ইউনিট ৩ বুদ্ধি, পরিবেশ ও বংশগতি

ভূমিকা

বুদ্ধি হল একটি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা। একজন শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল, তার শিক্ষার্থীকে জানা, বোঝা এবং তার সার্বিক বিকাশে যথাযথ সাহায্য করা। এজন্যই একজন শিক্ষকের জানা প্রয়োজন বুদ্ধি কী, বুদ্ধি কিভাবে বিকশিত হয় এবং পরিবেশের সাথে বুদ্ধির সম্পর্ক কী? বুদ্ধি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির স্তর সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছঁতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন, পাঠ উপস্থাপন ও পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির মাত্রা জানতে পারলে তিনি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকে আকর্ষনীয় ও কার্যকরী করে তুলতে পারেন। তাছাড়া মেধাবী ও অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী খুঁজে বের করতে, শ্রেণিবিন্যাস ও দলগঠন করতে, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে এবং সহপাঠ্যক্রমিক কাজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

বুদ্ধির সাথে আর যে দুটি বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে তা হল পরিবেশ ও বংশগতি। এই দুটি অবস্থাই পৃথকভাবে ও একত্রে ব্যক্তির উপর ক্রিয়া করে এবং তার বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বুদ্ধি, পরিবেশ ও বংশগতি এই তিনটি বিষয়েই মোটামুটি ধারণা লাভের জন্য এই ইউনিটের পাঠগুলোকে সাজান হয়েছে। এখানে মোট পাঁচটি পাঠ রয়েছে যার মাধ্যমে আপনি এই বিষয়গুলো জানতে পারবেন। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৩.১: বুদ্ধির ধারণা

পাঠ- ৩.২: বুদ্ধির বিকাশ

পাঠ- ৩.৩: বুদ্ধির পরিমাপ

পাঠ- ৩.৪: বুদ্ধির বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ

পাঠ- ৩.৫: বুদ্ধির বিকাশে শিক্ষকের দায়িত্ব

পাঠ ৩.১ বুদ্ধির ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বুদ্ধি বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বুদ্ধির সংজ্ঞা ও উপাদান উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির পার্থক্য করতে পারবেন।

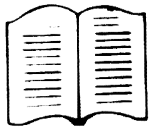

বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি। একে একক কোন সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করা যায়না। বুদ্ধির দিক থেকে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। কারণ মানুষই পারে নানা রকম প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে। তারপরও আমরা কাউকে বলি বুদ্ধিমান আবার কাউকে বলি বোকা। এই বোকা বা বুদ্ধিমান বিশেষণের নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি নেই। তবুও যখন কাউকে চালাক বা বোকা বলি তখন সেটা তার সাধারণ যোগ্যতার ভিত্তিতেই বলি। যাকে বোকা বলছি, সে হয়ত ওই নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে যোগ্যতা দেখাতে পারছেনা কিন্তু অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে ঠিকই এগিয়ে আছে। তাহলে তাকে বুদ্ধিহীন বা বোকা বলা কী ঠিক হবে? আসলে এজন্যই মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির সংজ্ঞাদানের ব্যাপারে একমত হতে পারছেননা। এক একজন মনোবিজ্ঞানী নিজ নিজ দৃষ্টিকোন থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেন। নিচে এরূপ কতগুলি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল:

বুদ্ধিকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে

- টারম্যান বলেন, *"বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি।"*
- থর্ণডাইক বলেন, *"বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।"*
- ওয়েসলারের মতে, *"বুদ্ধি হল এমন ক্ষমতা যার দ্বারা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কাজ করা যায়, যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করা যায় এবং পরিবেশের সাথে সঠিক মোকাবেলা করা যায়।"*
- বিনে মনে করেন, *"বুদ্ধি হল বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবনপটুতা, কোন কাজে অধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক বিচারশক্তি। অর্থাৎ কতগুলো ক্ষমতার সমষ্টি।"*
- স্পীয়ারম্যান বলেন- *"নিজের মনের প্রতিক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা এবং জ্ঞানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক আবিস্কারের ক্ষমতাই হলো বুদ্ধি।"*

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে একেক মনোবিজ্ঞানী একেক যোগ্যতার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং কোন সংজ্ঞাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তবে এই সংজ্ঞাগুলো থেকে বুদ্ধির ব্যাপকতা ধরা পড়ে। এই ব্যাপকতা ও গভীরতার জন্য একে নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা খুবই কষ্টকর। তবুও বুদ্ধি বলতে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি- এটা এমন একটা মানসিক শক্তি যা ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে, পরিবেশ পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে এবং দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বুদ্ধির মাত্রা

যেহেতু বুদ্ধিকে একটি ক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এটি কীরূপ ক্ষমতা? একমাত্রিক না বহুমাত্রিক? একমাত্রিক বুদ্ধি মানে হল সাধারণভাবে যে কোন ব্যাপারে বুদ্ধি রাখে সে সব বিষয়ে সমান বুদ্ধির অধিকারী। অর্থাৎ যে গণিতে ভাল সে সাহিত্যেও সমান পারদর্শী। অপরদিকে বুদ্ধির বহুমাত্রিকতা হল কোন ব্যক্তিই সব বিষয়ে একই রকম বুদ্ধির অধিকারী নয় বরং এক এক বিষয়ে এক এক রকম পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। মনোবিজ্ঞানী স্পিচ্ছারম্যান বুদ্ধিকে দ্বিমাত্রিক ক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে আমাদের সবার মধ্যেই বুদ্ধির একটি সাধারণ উপাদান 'G' বা General Factor রয়েছে। কিন্তু সেটা প্রয়োগ করে সব সমস্যার সমাধান হয়না। কিছু কিছু সমস্যা সমাধান করার জন্য 'G' এর অতিরিক্ত আরো একটি উপাদান বা ক্ষমতা প্রয়োজন যা কেবল নির্দিষ্ট কোন সমস্যা সমাধান করতে পারবে। স্পিচ্ছারম্যান এই বিশেষ উপাদানের নাম দিয়েছেন Specific Factor বা সংক্ষেপে 'S' উপাদান। স্পিচ্ছারম্যানের এই মতাবাদকে বুদ্ধির দ্বি-উপাদান তত্ত্ব বলা হয়।

পরবর্তীকালে অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিকে আরো অনেক উপাদানে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যেমন থার্ষ্টোণ বুদ্ধিকে সাতটি উপাদানে ভাগ করেন। তাঁর এই উপাদানগুলি হল:

১. **মৌখিক সংবোধন** (Verbal Comprehension)

২. **স্মৃতি শক্তি** (Memory)

৩. **যৌক্তিক জ্ঞান** (Reasoning)

৪. **স্থানিক সম্পর্ক দেখার যোগ্যতা** (Ability to Visualize Spatial Relationship)

৫. **সংখ্যা ব্যবহার যোগ্যতা** (Numerical Ability)

৬. **বাক পটুতা** (Word Fluency)

৭. **প্রত্যক্ষণের গতি** (Perceptual Speed)।

প্রশিক্ষণার্থীদের সীমিত প্রয়োজন ও স্থানাভাবের কথা বিবেচনা করেই থার্স্টোনের উপরোক্ত শ্রেণিগুলির বিস্তারিত বিবরণ এখানে পরিহার করা হল। যাই হোক উপরোক্ত উপাদানগুলোকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, এদের মধ্যে সহগ সম্পর্ক থাকলেও সবগুলিতে একই ধরনের সাফল্য অর্জন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেউ কোন একটি উপাদানে সাফল্য অর্জন করলেও অন্যটিতে ততটা সাফল্য দেখাতে পারে না।

বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি

মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও বুদ্ধির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, শিম্পাঞ্জী ছাড়াও কোন কোন প্রাণী যেমন, শিয়াল, কোকিল, বাবুই ইত্যাদিকে মানুষ বুদ্ধিমান মনে করে থাকে। কারণ তারা স্বাভাবিকভাবে এমন কিছু কাজ করতে পারে যা অন্য প্রাণীরা করতে পারেনা। এখানে বলে রাখা ভাল যে নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে যে বৌদ্ধিক আচরণ লক্ষ্য করা যায় তা আসলে বুদ্ধি নয়। এটি হল প্রবৃত্তি বা Instinct। প্রবৃত্তির সাথে বুদ্ধির পার্থক্য হল প্রথমোক্তটি ইচ্ছা বা

প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং সময় বিশেষে জৈবিকভাবেই এরূপ আচরণ নির্গত হয়। কিন্তু বুদ্ধি এর বিপরীত, ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা ফলে সৃষ্ট এবং প্রাণীকে অবশ্যই তা অর্জন করতে হয়। তাছাড়া প্রাণীর এমন কিছু আচরণ আছে যেগুলি প্রজাতি নির্দিষ্ট (Species-Specific) যেমন, কাঠবিড়ালী গাছের কোটরে বাসা বাধে কিন্তু অনুরূপ আর এক জাতের ইদুর মাটির গর্তে বাসা বানায়। এ জাতীয় পার্থক্য প্রধানত জৈবিক কারণেই সৃষ্টি হয়। এ ধরনের আচরণ বুদ্ধিজনিত নয় বরং তা হল প্রবৃত্তিজনিত। প্রাণীর জনন কোষের মাধ্যমে ক্রমোজোম নামক এক প্রকার উপাদানের সহায়তায় বংশ পরম্পরায় প্রবৃত্তিগত আচরণ বিস্তার লাভ করে কিন্তু বুদ্ধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরূপ কোন প্রক্রিয়ায় বিস্তার ঘটে না। বরং ইচ্ছা, প্রচেষ্ট ও নির্দেশনার ফলে পরিবেশ থেকে প্রাণী যখন কোন প্রতিক্রিয়া করে তাকেই বুদ্ধি বলে।

সারমর্ম

মানুষের বুদ্ধি বেশি আছে বলেই তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা হয়। মনে করা হয় বুদ্ধি এক প্রকার মানসিক শক্তি তবে এর প্রকৃতি সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা সবাই একমত হতে পারেন নাই। এক এক জন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধিকে এক এক ভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন, টারম্যান বলেন, "বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি"। আবার বিনের মতে, "বুদ্ধি হল বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবন পটুতা বা অধ্যবসায়ের ক্ষমতা ইত্যাদি।" বুদ্ধিকে স্পিয়ারম্যান দুই উপাদানে ভাগ করেছেন, থাস্টোর্ণ একে সাত উপাদানে ভাগ করেন। বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে এক জিনিস মনে করা হয় না। প্রবৃত্তি হল প্রাণীর সহজাত গুণ কিন্তু বুদ্ধি অর্জিত গুণ।

পাঠ ৩.২ বুদ্ধির বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বুদ্ধি বিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

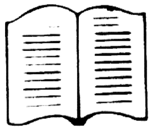

বয়সের সাথে সাথে বুদ্ধিও বাড়ে

মনোবিজ্ঞানী পিঁয়াজের মতে, শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ে ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। সাধারণভাবেও আমরা তা বুঝি, সময়ের সাথে সাথে এবং পরিবেশের প্রভাবে শিশুর বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু বুদ্ধি কোন বয়স পর্যন্ত বাড়ে, কতটা বাড়ে- এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা একক কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। শারীরিক পরিপক্কতার সাথে বুদ্ধি বিকাশের যোগসূত্র রয়েছে। বুদ্ধি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন হারে বিকশিত হয়ে থাকে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে, শৈশবে শিশুর বিকাশ হয় দ্রুতগতিতে, বাল্যকালে মাঝারি পর্যায়ের, কৈশোরে তা কমে যায়, প্রাপ্ত বয়সে কিছুটা বেড়ে যায়- তবে বৃদ্ধ বয়সে একেবারে কমে যায়। অনেক মনোবিজ্ঞানীই এ মতামতের সমর্থন করেননি, ফ্রিম্যান এক গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলের বুদ্ধির বিকাশ সব সময় একই হারে হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে শিশু শৈশবে নয় বৎসর বয়সে বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, সে পনের বৎসর বয়সেও বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে যে ছোট বয়সে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হয় সে পনের বৎসর বয়সেও অল্পবুদ্ধির পরিচয় দিবে। সকল ক্ষেত্রে ফ্রিম্যানের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। কারণ কেউ হয়ত ছোট বেলায় অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হল। তাই বলে ভবিষ্যতেও সে অল্পবুদ্ধিমান হবে এমন কোন ভবিষৎবাণী করা যায় না।

অনেকে মনে করেন, বয়সের সাথে ব্যক্তির বুদ্ধি বাড়লেও তার বুদ্ধ্যঙ্ক বুদ্ধি পায় না। কারণ বুদ্ধ্যঙ্ক হলো, প্রকৃত বয়স ও মানসিক বয়সের অনুপাত। সুতরাং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক ও প্রকৃত বয়স বাড়তে থাকে। কিন্তু ব্লুম (Bloom) এক গবেষণায় দেখেন যে, এক বৎসরের শিশুর বুদ্ধ্যঙ্কের সাথে একই শিশুর ১৭ বৎসরের বুদ্ধ্যঙ্কের কোন মিল নেই। আমরা অনেক সময় দেখি, বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যক্তি নানা রকম অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও শিক্ষা অর্জন করে থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা বলি ব্যক্তির বুদ্ধি বেড়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়, এখানে তার কৃতি অর্জিত হয়েছে। বুদ্ধি ও কৃতি এক জিনিস নয়। বুদ্ধি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়ে। কিন্তু কৃতি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টা আজীবন বেড়ে চলে। ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তীয় সীমার উপর নির্ভর করবে সে কতটা কৃতি অর্জন করতে পারবে।

কুড়ি বছরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না

বুদ্ধি বিকাশের শেষসীমা নিয়েও নানা রকম মতভেদ রয়েছে। সকল ব্যক্তির বুদ্ধির শেষসীমা একই সময়ে নিদিষ্ট করা যায় না, এতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্নতা রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের মতে, ষোল বৎসর পর্যন্ত ব্যক্তির বুদ্ধির বিকাশ হয়। মনোবিজ্ঞানী ওয়েসলারের মতে, যারা বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন, তাদের বিকাশ কুড়ি বৎসর পর্যন্ত হয়। এছাড়া বুদ্ধিমত্তা বিকাশে বিভিন্ন উপাদানেরও প্রভাব পড়ে। অনেকে মনে করেন, মানুষের মস্তিস্কের ওজন বাড়া ও কমার সাথে সাথে বুদ্ধিও কমে বাড়ে। সুতরাং মস্তিস্কের সাথে বুদ্ধির একটা সম্পর্ক রয়েছে।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মস্তিস্ক ছোট থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মস্তিস্কের কোষগুলো বড় হয় ও এক কোষের সাথে অন্য কোষের সম্পর্ক জটিল হয়। অতএব, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশও সাধিত হয়। শিশুর চারিপাশের পরিবেশের উপরও নির্ভর করে তার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ। পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা বুদ্ধির বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, অভিন্ন জমজ দুটো শিশুকে আলাদা পরিবেশে রাখার ফলে, তাদের বুদ্ধিমত্তার তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের বুদ্ধি বিকাশের একটি বিশেষ ধারা রয়েছে এবং তা সবার মধ্যে একই নিয়ম অবলম্বন করে না। তবে মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে মনে করেন যে, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধি বাড়ে কিন্তু তারপরে এতে আর তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। বুদ্ধির বিকাশের দিক দিয়ে উন্নত ও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে সব সময়ই একটি পার্থক্য থাকে। উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুরা তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে আনুপাতিকভাবে সবসময়ই এগিয়ে থাকে। অপর দিকে মানসিক প্রতিবন্ধীও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মানসিক বিকাশও ধীরগতি সম্পন্ন হয়। এদের পরিবেশকে যদি উন্নত করা যায় ও যথার্থ উপকরণের মাধ্যমে এশিক্ষণ দেওয়া যায় তবে বহুলাংশেই তাদের বুদ্ধিকে কিছুটা বিকশিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ একটি সীমার পর চেষ্টা করেও আর বাড়ান যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, মানুষের বুদ্ধির বৃদ্ধি সাধারণত ১৮-২০ বৎসর পর্যন্ত হয়। তারপর সাধারণভাবে অল্পকিছু পরিবর্তন হলেও তেমন উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তন হয় না। এছাড়া নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশ, পরিস্থিতি, মস্তিস্কের অসুস্থতা, ইন্দ্রিয়ের ক্রটি ইত্যাদি কারণে বুদ্ধির সুষ্ঠ বিকাশ ব্যহত হতে পারে, তবে এসব যদি দূর করা যায় তাহলে ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক বাড়তে পারে। অর্থাৎ বুদ্ধির যথার্থ বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ দুটোই সমানভাবে জড়িত রয়েছে।

সারমর্মঃ

শিশুর বয়সের সাথে সাথে তার বুদ্ধিও বাড়ে কিন্তু এই বৃদ্ধি কত বয়স পর্যন্ত হয় তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বয়সের সাথে বুদ্ধি বাড়লেও তার বুদ্ধ্যঙ্ক বাড়ে না কারণ বুদ্ধ্যঙ্ক হল মানসিক বয়স ও স্বাভাবিক বয়সের অনুপাত। মনোবিজ্ঞানী টারম্যান মনে করেন যে, বুদ্ধি ষোল বৎসর পর্যন্ত বাড়ে আবার ওয়েসলারের মতে এটা কুড়ি বৎসর পর্যন্ত হয়। বুদ্ধি বিকাশের দিক দিয়ে উন্নত ও স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে সবসময়ই একটা পার্থক্য থাকে। আবার মানসিক প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসিক বিকাশ তথা বুদ্ধিও ধীর গতিতে বাড়ে।

পাঠ ৩.৩ বুদ্ধির পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বুদ্ধির পরিমাপ বলতে কি বুঝায়, তা বলতে পারবেন;
- কীভাবে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করতে হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- কী কী উপায়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।

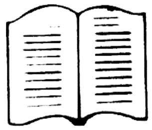

অনেক অনেক দিন আগে মানুষের দেহের আকার আকৃতি ও মস্তিষ্কের গঠনের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধি পরিমাপ করা হতো। স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বুদ্ধি অভীক্ষার উপর বেশ কিছু কাজ করেন। তবে আলফ্রেড বিনেকে বুদ্ধি অভীক্ষার জনক হিসেবে ধরা হয় কারণ তিনিই সঠিকভাবে মানুষের বুদ্ধি পরিমাপ করে দেখান। বুদ্ধি অভীক্ষা দ্বারা ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, মানসিক ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিক্রিয়া এবং অর্জিত কৃতি পরিমাপ করা হয়। এছাড়া ব্যক্তির অর্জিত সাফল্য দিয়ে তার আভ্যন্তরীণ মানসিক ক্ষমতাও পরিমাপ করা যায়। বুদ্ধি যে পরিমাপ করা যায় এব্যাপারে মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একমত। তবে সবাই বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষা অবলম্বন করে থাকেন।

বিনে সাইমন স্কেল

মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনে এবং তার সহকর্মী সাইমন মিলে ১৯০৫ সালে একটি বুদ্ধি অভীক্ষা তৈরি করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এ অভীক্ষার সংস্কার ও পরিমার্জন করা হয়। এই অভীক্ষাটি কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে গঠিত। সমস্যা বা প্রশ্নগুলো বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যেমন, চিনতে পারা, মনে করা, যুক্তিবোধ, তুলনা করা, সম্পর্ক নির্ণয় করা, সংখ্যা ব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন। এছাড়া প্রশ্নগুলি সহজ থেকে কঠিন, কঠিন থেকে আরো কঠিন ভাবে সাজানো হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নটি একেবারে সহজ, এবং শেষ প্রশ্নটি একেবারে কঠিন এভাবে।

যেহেতু এই অভীক্ষাটি একটি স্কেল হিসাবে তৈরি সেহেতু এর এককগুলো ছোট থেকে বড় এবং সমান দূরত্বে সাজানো হয়েছে। এখানে একক হিসাবে অভীক্ষার্থীর বয়সকে ধরা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় স্কেলটিতে বয়সকে সর্বনিম্ন ৩ বৎসর, তারপর ৪ এভাবে ধাপে ধাপে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বয়সানুপাতিক সাব-স্কেলের সমন্বয়ে পুরো অভীক্ষাটি প্রণীত হয়েছিল। অবশ্য স্কেলটির পরবর্তী সংস্করণে সর্বনিম্ন একক ২ বৎসর ও সর্বোচ্চ ১৪ বৎসর ধরা হয়েছে। অভীক্ষার প্রথম দিকে ৪ বছর পর্যন্ত ৬ মাস পরপর এবং পরবর্তীতে ৫ থেকে ১৪ পর্যন্ত ১ বৎসর করে ধাপে ধাপে অভীক্ষার সাব-স্কেলগুলি সাজান রয়েছে। অর্থাৎ ২, ২$\frac{1}{2}$, ৩, ৩$\frac{1}{2}$, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ বৎসর বয়সের জন্য মোট ১৫টি সাব স্কেল ছিল।

এই অভীক্ষায় সর্বপ্রথম মানসিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। কোন অভীক্ষার্থীর আসল বা প্রকৃত বয়স যাই হোক না কেন, সে যে নির্ধারিত বয়সের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তাই হবে তার

মানসিক বয়স। মানসিক বয়স প্রকৃত বয়সের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। যেমন: ৩ বছরের শিশুদের দুটি কাঠির দৈর্ঘ্য তুলনা করতে বলা। ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যা দেওয়া বা কিছু ব্লক বানাতে বলা। অপর দিকে বড়দের জন্যেও অনুরূপ কিছু সমস্যা দেওয়া যায় যা তাদের বয়স উপযোগী।

স্টানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টারম্যান ১৯১৬ সালে বিনের অভীক্ষাটির নবতর একটি সংস্করণ করেন। সেই থেকে একে স্টানফোর্ড-বিনে অভীক্ষা বলা হয়। মনোবিজ্ঞানী টারম্যান মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের মধ্যে তুলনা করে বুদ্ধি পরিমাপ করেন। এছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম "বুদ্ধ্যাঙ্ক" (Intelligence Quotient) এর ধারণা ব্যবহার করেন এবং একে সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেন। বুদ্ধাঙ্ক হল ব্যক্তির প্রকৃত বয়সের সাথে মানসিক বয়সের অনুপাত। জন্ম থেকে বুদ্ধ্যাঙ্ক পরিমাপ করার সময় পর্যন্ত যে বয়স তা হল তার প্রকৃত বয়স কিন্তু ব্যক্তি যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তা হলো তার মানসিক বয়স। ধরুন, এক জনের প্রকৃত বয়স ১০ বৎসর এবং মানসিক বয়স ১২ বৎসর। অর্থাৎ তার জন্ম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বয়স হল ১০ বৎসর। কিন্তু সে ১২ বৎসরের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে বলে তার মানসিক বয়স ১২ ধরা হয়েছে। এখন বুদ্ধ্যাঙ্ক কিভাবে নির্ণয় করবেন? চলুন, তাহলে দেখি, বুদ্ধ্যাঙ্কের সূত্রটি কী? কীভাবেই বা বুদ্ধ্যাঙ্ক বের করা হয়?

$$\text{বুদ্ধ্যাঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times \text{১০০}$$

উপরোক্ত উদাহরণটি দিয়ে বুদ্ধ্যাঙ্ক বের করা যায়।

যেমন: ব্যক্তির প্রকৃত বয়স = ১০

ব্যক্তির মানসিক বয়স = ১২

$$\text{অতএব বুদ্ধ্যাঙ্ক} = \frac{12}{10} \times 100 = 120$$

এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন কিন্তু যদি তার মানসিক বয়স ৮ হয় তবে তার বুদ্ধ্যাঙ্ক হবে ৮০ (উপরের সূত্র অনুযায়ী)। অর্থাৎ ব্যক্তিটি অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। আবার যদি তার মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়স সমান অর্থাৎ দুটোই ১০ বৎসর হয় তাহলে বুদ্ধ্যাঙ্ক হবে ১০০। অর্থাৎ সে সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন। এই অভীক্ষাটি বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় একটি অভীক্ষা। তারপরও এটা ব্যক্তি ভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা বলে অনেকেই এর সমালোচনা করে থাকেন।

ছক: ৩.১: বিভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য বুদ্ধি অভীক্ষার নমুনা

তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যঃ

১. চোখ, নাক, মুখ ইত্যাদি দেখানো।

২. ছোট অংক পুনরাবৃত্তি করা।

৩. ছবি দেখে বিভিন্ন জিনিসের নাম করা।

৪. পদবী বলা।

৫. ছয় শব্দ বিশিষ্ট বাক্য পুনরাবৃত্তি করা।

পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্যঃ

১. দুটো বস্তুর ওজন তুলনা করা।

২. বর্গক্ষেত্র দেখে আঁকা।

৩. দশ শব্দ বিশিষ্ট বাক্য পুনরাবৃত্তি করা।

৪. চারটি মুদ্রা গণনা করতে পারা।

৫. একটি আয়তক্ষেত্রের দুটি অংশকে যুক্ত করা।

দশ বছর বয়সের শিশুদে জন্যঃ

১. পাঁকা বস্তুকে ওজনক্রমে সাজানো।

২. দুটো ছবি দেখার পর মনে মনে আঁকা।

৩. যুক্তিহীন বক্তব্যকে সমালোচনা করা।

৪. কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

৫. তিনটি শব্দকে দুটি বাক্যে ব্যবহার করা।

ওয়েসলার বুদ্ধি অভীক্ষা

নিউইয়র্কের বেলেভিউ হাসপাতালের মনোবিজ্ঞানী ডেভিড ওয়েসলার ১৯৩৯ সালে বয়স্কদের জন্য একটি অভীক্ষা তৈরি করেন। ১৯৫৫ সালে এই অভীক্ষাটির উন্নত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি ওয়েসলার "বয়স্ক বুদ্ধি অভীক্ষা" Wechsler Adult Intelligence Scale নামে পরিচিত। একে সংক্ষেপে WAIS বলা হয়। এছাড়া তিনি শিশুদের জন্য দুটো অভীক্ষা তৈরি করেন। যেমনঃ ওয়েসলার ইনটেলিজেনস্ স্কেল ফর চিলড্রেন (Wechsler Intelligence Scale for Children) এবং ওয়েসলার প্রিস্কুল এন্ড প্রাইমারী স্কেল অব ইনটেলিজেনস্ (Wechsler Pre-school and Primary Scale of Intelligence)। সংক্ষেপে এ দুটো স্কেলকে যথাক্রমে WISC ও WPPSI অভীক্ষা বলা হয়। ওয়েসলারের অভীক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এতে ভাষামূলক ও কার্যসম্পাদনী এই দুই ধরণের দক্ষতা পরিমাপক প্রশ্নই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিনের স্কেলে কেবল ভাষাভিত্তিক প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত ছিল। এসব অভীক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থী, পেশাজীবী ও অন্যান্য মানুষের বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন দলগত অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমনঃ আর্মি আলফা, আর্মি বিটা, ইত্যাদি নানা ধরণের অভীক্ষা।

ছক: ৩-৩.২: বুদ্ধ্যাঙ্ক বন্টন তালিকা

শ্রেণিবিভাগ	বুদ্ধ্যাঙ্ক	শতাংশ
অত্যন্ত উচ্চমান সম্পন্ন	১৪০ বা এর উপর	১.৩
উচ্চমান সম্পন্ন	১২০-১৩৯	১১.৩
গড় উচ্চমান সম্পন্ন	১১০ - ১১৯’	১৮.১
গড় মান সম্পন্ন	৯০ - ১০৯	২৫.৫
গড় নিম্নমান সম্পন্ন	৮০ - ৮৯	৩৭.৫
প্রান্তীয় স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন	৭০ - ৭৯	৫.৬
ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন	৬৯ বা এর নিচে	২.৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বল্প ও মেধাবী বুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে, আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা নির্ণয় করতে এবং অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ করতে বুদ্ধি অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সারমর্ম:

অলফ্রেড বিনেকে বুদ্ধি অভীক্ষার জনক মনে করা হয় কারণ তিনিই ১০৫ সালে সহকর্মী সাইমনের সহযোগিতায় প্রথম বুদ্ধি অভীক্ষা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে তাঁদের অভীক্ষাকে ২ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়। এই অভীক্ষায় শিশুরা যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে সে বয়সই হল তার মানসিক বয়স। এভাবে নির্ণিত মানসিক বয়সকে স্বাভাবিক বয়স দিয়ে ভাগ করে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে বলে বুদ্ধ্যাঙ্ক। বিনের অভীক্ষার পর ডেভিড ওয়েসলার নামে আর একজন আরো উন্নত ধরনের একটি অভীক্ষা তৈরি করেন।

পাঠ ৩.৪ বুদ্ধি বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বংশগতি ও পরিবেশ বলতে কি বুঝায়, তা বলতে পারবেন;
- বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বংশগতি ও পরিবেশের উপর দুই একটি গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।

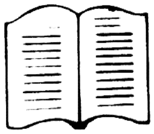

শিশুর বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব জানার আগে আমাদের জানা উচিত, বংশগতি কি? পরিবেশই বা কি? বংশগতি হল মা, বাবা ও পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জন্মগত ভাবে পাওয়া শারীরিক, মানসিক এবং স্বভাবগত কিছু বৈশিষ্ট্য। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যই একজন ছেলে বা মেয়ে বাবা, মা কিংবা পরিবারের অন্য কোন পূর্বপুরুষের অনুরূপ চেহারা সম্পন্ন হয় অথবা কথাবার্তায়, চাল-চলনে ও মন মানসিকতায় একই ধরনের হয়ে থাকে।

অপর দিকে, সাধারণভাবে পরিবেশ বলতে যা বুঝায়, তা হল, ব্যক্তির চারপাশে যা কিছু আছে তা সবই পরিবেশ। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে পরিবেশকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ পরিবেশ বলতে বুঝায় তার ঘর-বাড়ি, স্কুল, মা-বাবা, ভাই-বোন, কৃষ্টি, ধর্ম, প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়। এক কথায়, যা একক অথবা সমষ্টিগত ভাবে ব্যক্তির আচরণে প্রভাব রাখে তাই ব্যক্তির পরিবেশ। এখানে বংশগতি ও পরিবেশ নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বংশগতি

বংশগতিও বুদ্ধির একটি নিয়ন্ত্রক

অনেক সময় কারো বুদ্ধির প্রশংসা করতে গিয়ে আমরা বলে থাকি, দেখতে হবেনা কার সন্তান! কেন এমন বলছি? এর কারণ হল আমরা বংশগত ভাবে পাওয়া শিশুর সুপ্ত বুদ্ধি বা প্রতিভাকে ইঙ্গিত করছি। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধি বিকাশে বংশগতির ধারাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে, কোন ব্যক্তি কতটুকু বুদ্ধিমান হবে তা সে জন্মগত ভাবেই পেয়ে থাকে। তাঁরা এর স্বপক্ষে নানা রকম যুক্তি ও গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশ করেছেন। বংশগতিবাদী হিসেবে ফ্রান্সিস গ্যালটনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সমাজের ৯৭৭ জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের জীবন ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে তার মধ্যে ৫৩৬ জনই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। অপরপক্ষে সমাজের অতিসাধারণ ৯৭৭ জন ব্যক্তির বংশের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে, এদের মধ্যে মাত্র ৪ জন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি বলেন যে, এর মূল কারণ হল বংশধারার প্রভাব, তিনি কার্ল পিয়ারসন, ডারউইন, ওয়েজড ও গ্যাল্টন পরিবারের একহাজার বছরের পারিবারিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান যে, ইংল্যান্ডের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতে এই পরিবারগুলির বিরাট অবদান রয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি বংশগতির ধারাকেই চিহ্নিত করেন।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বাবা মায়ের বুদ্ধির সাথে তাদের শিশুদের বুদ্ধির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী হিলগার্ড এক গবেষণায় দেখান যে, শিশুদের সাথে তাদের বাবা মায়ের

বুদ্ধ্যাঙ্কের অনুবন্ধ ০.৩০-০.৪০ পর্যন্ত হয় কিন্তু শিশুদের সাথে পালক পিতার বুদ্ধ্যাঙ্কের অনুবন্ধ শূন্য হয়। সুতরাং বুদ্ধির উপর বংশগতির যে ব্যাপক প্রভাব রয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরিবেশ

পরিবেশ দ্বারাও বুদ্ধি প্রভাবিত হয়

অনেক সময় আমরা কারো কথায় বিরূপ মন্তব্য করতে গিয়ে বলে থাকি, ও কী করে এমন কথা বললো? পরমুহূর্তেই আবার বলে উঠি, না এতে ওর দোষ নেই, আসলে ও যে পরিবেশে মানুষ সে পরিবেশই এর জন্য দায়ী। বলুনতো এর দ্বারা কি প্রকাশ পায়? আসলে এক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা বিকাশের সাথে পরিবেশকে জড়ানো হয়েছে। এর সূত্র ধরেই বলতে হয়, বুদ্ধির বিকাশে পরিবেশই মুখ্য- অনেক মনোবিজ্ঞানীই একথা মনে করেন। তাদের মতে, বুদ্ধির বিকাশে বংশগতির কোন গুরুত্ব নেই।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা বিকাশে বংশগতি নয় বরং পরিবেশই প্রধান। মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনিই বংশগতিবাদীদের বলেছেন যে, “আমাকে একজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশু দিন, আমি ইচ্ছামত তাদের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারি”। জন লক, রবার্ট আওয়েল এই মতকে সমর্থন করেন। ক্যাটেল আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানীর পারিবারিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে দেখান যে, বুদ্ধির বিকাশ আর্থিক অবস্থা, লোক বসতি, আদর্শ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

হেলেন ও গ্লাডিস নামে দুই সমকোষী জমজ শিশু ঘটনা চক্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়। অনেক বছর পর তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, তাদের মধ্যে সামাজিক, মানসিক ও আবেগের বিকাশে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। টারম্যান ও মেরিল গ্রাম ও শহরের সমকোষী জমজের উপর পরীক্ষা করে দেখেন যে, গ্রামের তুলনায় শহরের শিশুদের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশি।

এছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বন্য পরিবেশে পালিত বালক উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে মানবীয় গুনাবলীর বিকাশ থেকে বঞ্চিত থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের ও জিপসী ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যায়, ব্যক্তির জীবনে পরিবেশের ভূমিকা কত ব্যাপক। পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার উপরও বুদ্ধির বিকাশের তারতম্য ঘটে থাকে। নিউম্যান, ফ্রীম্যান ও মিচেল এ মতবাদের সমর্থক।

বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাব

এতক্ষণ আমরা বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করলাম। তবে, শিশুর বুদ্ধির বিকাশে উভয় উপাদানেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটিকে ছাড়া অন্যটি অচল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য একথা সমর্থন করেন। ধরা যাক্ একটি বুদ্ধিদীপ্ত পরিবারের শিশুকে প্রতিকুল পরিবেশে রাখা হল, এতে দেখা যাবে যে, উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তার সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত হয়নি। একই ভাবে, জন্মগতভাবে একটি অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুকে ভাল পরিবেশে রাখা হলে দেখা যাবে যে, তার বুদ্ধ্যঙ্ক তেমন বাড়তে পারছেনা।

বংশগতি ও পরিবেশ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে গবেষণা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা দেখাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তি জীবনের বিকাশ কেবল বংশ ধারার উপরই নির্ভর করে না বরং পরিবেশের উপরও তার কিছুটা নির্ভরতা রয়েছে। শিশুর জন্মমুহূর্তে যে সম্ভাবনা থাকে তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের

জন্য পরিবেশের প্রয়োজন। অন্যদিকে পরিবেশ যত উন্নতই হোকনা কেন, শিশুর মধ্যে যদি বিকাশধর্মী উপাদান না থাকে, তার জীবন বিকাশ কোন ভাবেই সম্ভব হয় না। এস্কিমো ও মেক্সিকানদের বুদ্ধিমত্তা একই হারে বাড়েনা, এর মূলে রয়েছে বংশগতধারা ও পরিবেশ। নিউম্যান, ফ্রীম্যান ও হলজিঙ্গার এক গবেষণায় দেখেন যে, কোন ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব বেশি আবার কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব বেশি। অর্থাৎ ব্যক্তির সুষ্ঠ বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তির মধ্যে তার বংশগত বুদ্ধির সীমা রেখা জন্মগত ভাবেই থাকে- তা বিকশিত হয় উপযুক্ত পরিবেশের মাধ্যমে।

সারমর্মঃ

বংশগতি হল মা, বাবা বা পূর্বপুরুষের নিকট থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া শারীরিক, মানসিক বা স্বভাবগত কিছু বৈশিষ্ট্য। এই বংশগত কারণে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন ব্যাপারে কিছু মিল পরিলক্ষিত হয়। আবার পরিবেশের কারণেও ব্যক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দুটির মধ্যে কোন উপাদানটি ব্যক্তির পরিবর্তনের বেশি প্রভাব রাখে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী গ্যালটন বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির উপর গবেষণা চালিয়ে তাদের উপর বংশগতির প্রভাব অধিক বলে প্রমাণ করেন আবার ওয়াটসন অনুরূপ গবেষণা চালিয়ে পরিবেশের প্রভাব অধিক বলে প্রমাণ করেন।

পাঠ ৩.৫ বুদ্ধি বিকাশে শিক্ষকের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বুদ্ধি বিকাশে শিক্ষকের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন।

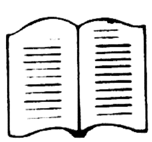

একজন শিক্ষার্থী দিনের বেশ কিছুটা সময় বিদ্যালয়ে থাকে এবং শিক্ষকের সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকই শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ, উদ্দীপনা ও কৌতুহল সৃষ্টি করে এবং উপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে তার বুদ্ধির বিকাশকে সম্পূর্ণ করতে পারেন। সুতরাং শিক্ষার্থীর বুদ্ধি বিকাশে শিক্ষক তথা বিদ্যালয়ের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীরা নানাধরনের পরিবেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে শিক্ষক ইচ্ছে করলে তাদের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে বংশগত বৈশিষ্ট্য বদলাতে পারেন না। শিক্ষক শিক্ষার সুষ্ঠ ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির বিকাশকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সম্ভাবনা কতটা বিকশিত হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের যথাযথ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের উপর।

শিক্ষক জ্ঞান অর্জনে সহায়তাকারী

একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞান বিতরণ করবেন এবং শিক্ষার্থী সর্বান্তকরণে তা গ্রহণ করবে। এই ধারণা বর্তমানে অচল, কারণে শিক্ষার্থী এমন কোন যন্ত্র নয় যে সব কিছু পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এগিয়ে যাবে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে। শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী কী গ্রহণ করবে বা কতটা গ্রহণ করবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে তার মন, মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার উপর। শিক্ষককে তাই এই উপাদানগুলির কথা স্মরণে রেখে শিক্ষণীয় বিষয়কে গ্রহণীয়ভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে। বাকী কাজ শিক্ষার্থী নিজেই করবে, শিক্ষকের চাপা-চাপির কোন সুযোগ এখানে নেই। অতএব, আধুনিক ধারণায় শিক্ষক আর জ্ঞান বিতরণকারী নন বরং শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের সহায়তাকারী (Facilitator)।

জ্ঞান অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়

ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞান খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। তাছাড়া শিক্ষার্থী যেহেতু নিজের গরজে তা শিখেনা তাই পরবর্তীতে এর তেমন বিকাশও সাধিত হয় না। সুতরাং শিক্ষাটা নিজের গরজে হওয়া প্রয়োজন এবং তার পিছনে একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রেষণা থাকা দরকার যাতে বিষয়বস্তুর কিছুটা ধরিয়ে দিলে শিক্ষার্থী নিজেই। অতি আগ্রহের সাথে বাকীটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয়। শিক্ষাকের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি গরজ সৃষ্টি করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা।

আসুন তাহলে আমরা দেখি, শিক্ষক কী কী উপায়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন-

ক) শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সহজ ও আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে- যাতে বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

খ) শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে।

গ) বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি করে, যাতে আলো-বাতাস চলাচল, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বসার সঠিক ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপযোগী এবং স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়ে তুলে।

ঘ) শিক্ষা উপকরণ সঠিক ও যথেষ্ট পরিমানে ব্যবহার করে।

ঙ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ, সহানুভূতিশীল এবং সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলে। এতে করে শিক্ষার্থী কোন কিছু না বুঝলে সহজেই প্রশ্ন করে তা বুঝে নিতে পারবে। এছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত যাতে বিজ্ঞান সম্মত হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

চ) শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই করে। তাদের ফলাফলের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করা এবং সে অনুযায়ী পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া। এতে নিজেদের সমস্যা তারা বুঝতে পারবে এবং তা দূর করার চেষ্টা করবে।

ছ) শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা, আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা ভ্রমন জনহিতকর কাজ ইত্যাদি নানা রকম বিষয় থাকতে হবে।

জ) শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সে ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। এর জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে স্বাস্থ্য রক্ষার সঠিক নিয়ম কানুন শেখাতে হবে। শিক্ষার্থীদের নানাবিধ আচরণগত সমস্যা যাতে দূর করা যায় সে ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে।

ঝ) শিক্ষক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন কিংবা তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে দিয়ে যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারেন ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন।

ঞ) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের যথাযথ সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিতে পারেন।

ট) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, ঝোঁক, মেধা ও প্রবণতা অনুসারে সঠিক নির্দেশনা ও পরিচালনা করতে পারেন।

ঠ) পাঠের বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে এবং ওই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিত্য-নতুন ধারণার সাথে পরিচিত করাতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহ বেড়ে যায়।

ড) শিক্ষার্থীর মেধা ও শারিরীক, মানসিক বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা এবং সে অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষার্থীর জন্মগত বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক না কেন, একমাত্র শিক্ষকই পারেন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সম্ভবনার বিকাশ ঘটিয়ে শিখনে সহায়তা করতে।

সারমর্ম:

একজন শিক্ষার্থী যেহেতু দিনের একটা বৃহৎ অংশ বিদ্যালয়ে থাকে তাই শিক্ষকের পক্ষে তার মধ্যে কোন ভাল বা মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করা সহজ। শিশুরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে এবং শিক্ষক তাদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে এনে শিশুদের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন আনেন। প্রধানত যে যে উপায়ে শিশুদের মধ্যে এই পরিবর্তন আনা যায় তা হল: (ক) শিক্ষার বিষয়কে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা; (খ) শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে শিশুদের উপযোগী করে বিষয় উপস্থাপন করা; (গ) বিভিন্ন প্রকার সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা এবং (ঘ) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে এগিয়ে নেওয়া ইত্যাদি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ইউনিট ৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি, এই সংজ্ঞাটি কার?
ক. টারম্যান
খ. ওয়েসলার
গ. স্পিচ্ছারম্যান
ঘ. থর্ণডাইক।

২. বুদ্ধির সাধারণ উপাদান মানে কী?
ক. যে উপাদান সব ব্যক্তির মধ্যে সমান ভাবে থাকে
খ. যে উপাদান বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে থাকে
গ. যে উপাদান সব সমস্যা সমাধানের কাজে লাগে
ঘ. যে উপাদান বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধানে লাগে।

৩. প্রধানত মানুষ .... দ্বারা ও প্রাণী .... দ্বারা চালিত হয়।
ক. ইচ্ছা, বুদ্ধি
খ. বুদ্ধি, প্রবৃত্তি
গ. প্রবৃদ্ধি, বুদ্ধি
ঘ. ইচ্ছা, অনিচ্ছা।

৪. বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে নিচের কোনটি ক্রমান্বয়ে বাড়ে?
ক. কৃতি ও দক্ষতা
খ. বুদ্ধি ও বুদ্ধঙ্ক
গ. কৃতি ও বুদ্ধি
ঘ. প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা।

৫. নিচের কোন জনকে বুদ্ধি অভীক্ষার জনক বলে মনে করা হয়?
ক. ফ্রান্সিস গ্যালটন
খ. আলফ্রেড বিনে
গ. ডেভিড ওয়েসলার
ঘ. স্পিচ্ছারম্যান।

৬. বুদ্ধ্যঙ্ক কী?
ক. এক রকম মানসিক ক্ষমতা
খ. ব্যক্তি জন্মগত একটি ক্ষমতা
গ. প্রকৃত ও মানসিক বয়সের অনুপাত
ঘ. বুদ্ধি ও মানসিক বয়সের অনুপাত।

৭. ডেভিড ওয়েসলার কত সালে তার অভীক্ষাটি প্রস্তুত করেন?
ক. ১৯৩৯ সালে
খ. ১৯৪৫ সালে
গ. ১৯৪৯ সালে
ঘ. ১৯৫৫ সালে।

৮. ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা সাধারণত কিসের উপর নির্ভর করে?
ক. বংশগতির উপর
খ. বয়সের উপর
গ. পরিবেশের উপর
ঘ. খ ও গ এর উপর ।

৯. "আমাকে একজন সুস্থ স্বাভাবিক শিশু দিন, আমি ইচ্ছামত তাদের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারি"- এই কথা কে বলেছিলেন?
ক. আলফ্রেড বিনে
খ. ওয়াটসন
গ. ওয়েসলার
ঘ. ফ্রীম্যান।

১০. শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর মূল দায়িত্ব কার?
ক. মনোবিজ্ঞানীর
খ. বাবা মা'র
গ. সমাজের
ঘ. শিক্ষকের।

নিজে নিজে করুন

১। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানের বই পর্যালোচনা করে বিনে ও ওয়েসলারের বুদ্ধি অভীক্ষার উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
২। উদাহরণ সহ মানুষের বুদ্ধির বিকাশে পরিবেশ ও বংশগতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।
৩। এই ইউনিট পাঠের সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে আপনার শ্রেনির সকল শিক্ষার্থীদের স্বল্প, মাঝারী ও অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

১. বুদ্ধি বলতে কী বুঝায়, আলোচনা করুন।

২. মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির সম্পর্কে একমত হতে পারেনা কেন?

৩. বুদ্ধির তিনটি সংজ্ঞা দিন। মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিকে কী কী উপাদানে ভাগ করেন?

৪. বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মূল পার্থক্য কী?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

১. মানুষের বুদ্ধি কীভাবে বাড়ে আলোচনা করুন।

২. বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশ কীভাবে প্রভাব ফেলে?

৩. আপনার শ্রেণির একটি বুদ্ধিমান ও আর একটিট স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু বেছে নিয়ে তাদের পটভূমি আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

১. বুদ্ধি অভীক্ষা দ্বারা সাধারণত কোন কোন দক্ষতা পরিমাপ করা যায়?

২. বিনে ও সাইমন কোন সালে তাঁদের অভীক্ষা তৈরি করেন?

৩. ওয়েসলার ও বিনের অভীক্ষার মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে?

৪. বুদ্ধ্যাঙ্ক পরিমাপের সূত্র কি?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

১. বংশগতি ও পরিবেশ বলতে আপনি কী বুঝেন আলোচনা করুন।

২. বংশ যে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে প্রভাবিত করে তা কিভাবে বুঝা যায়?

৩. পরিবেশ দ্বারা বুদ্ধি কিভাবে প্রভাবিত হয়?

৪. বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

১. শিশুর বুদ্ধি বিকাশে শিক্ষকের দায়িত্ব আলোচনা করুন।

২. বিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

উত্তরমালা- ইউনিট ৩

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। ক; ২। গ; ৩। খ; ৪। ক; ৫। খ; ৬। গ; ৭। ক; ৮। ঘ; ৯। খ; ১০। ঘ